ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

25 YEARS TOGETHER AGAINST CORRUPTION

‘বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: গণমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ’

জাফর সাদিক

অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

৯ ডিসেম্বর ২০২১

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুঘটকের ভূমিকা রয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যম অন্তত তিনটি প্রধান কাজ করতে পারে– দুর্নীতির নজরদারি করা, সততা প্রচার করা এবং দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টায় নাগরিকদের জড়িত করা। এছাড়াও গণমাধ্যম দুর্নীতির ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে জানাতে পারে এবং তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে দুর্নীতির সাথে জড়িতদের রাজনৈতিক ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।[১]

প্রত্যক্ষ গবেষণা থেকেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের বহুত্ব এবং দুর্নীতির স্তরের (Level) মাঝে একধরণের সম্পর্ক পাওয়া যায়।[২] সরকার ও ব্যবসায়িক কর্তাদের নানা অসঙ্গতি ও সীমালঙ্ঘন উন্মোচনে স্বাধীন ও সজাগ গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রবল। সরকারি ও বেসরকারী খাতের দুর্নীতির তথ্য প্রকাশেও গণমাধ্যমের শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে, যা জনগণের সম্পত্তির অপব্যবহার রুখে দিতে পারে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের ধরা পড়ার ও শাস্তি লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এভাবে গণমাধ্যম রাজনৈতিক, সরকারি, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সার্বিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করতে সহায়তা করে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অবস্থা মূল্যায়নেও স্বচ্ছতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা মুক্ত গণমাধ্যমের গুরুত্ব তুলে ধরে।[৩]

গণমাধ্যম ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাঃ

নথিবদ্ধভাবে সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে 'স্বল্পসময়ে নতুন ও বিস্তৃত বাজারে নানা গল্প প্রাপ্তির লাভজনক মাধ্যম হিসেবে' গণমাধ্যম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিলো।[৪] পরবর্তীতে গণমাধ্যমকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য উপস্থাপনের একটি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। তবে এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতবাদ বিদ্যমান।

বেঞ্জামিন গণমাধ্যমকে 'বিভিন্ন বিষয় মানবিক ও স্থানিকভাবে আরো ঘনিষ্ঠ করতে, সমকালীন জনগণের আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দেখেন'। তার মতে, 'এই বিষয়সমূহ শুধুমাত্র প্রকৃতি দ্বারা নয়, বরং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।' তার এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু সমসাময়িক সংস্কৃতি ও ব্যক্তির জন্য একটি পণ্যমাত্র।[৫] অডর্নো গণমাধ্যমকে 'গণসংস্কৃতি কিংবা 'সাংস্কৃতিক কারখানা' উদ্ভূত বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা গণমানুষের সাধারণ চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয় এবং দিনশেষে সেই চেতনাকেই ঘেরাটোপে বন্দী করে ফেলে। তিনি গণমাধ্যমকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলার বস্তু হিসেবে বর্ণনা করেন।[৬] চমস্কি গণমাধ্যমকে 'সম্মতি উৎপাদন'-এর হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৭] অর্থাৎ গণমাধ্যম ক্ষমতাসীনদের পক্ষে গণমানুষের সম্মতি উৎপাদন করে।

অধুনা সময়ে গণমাধ্যম জনসাধারণের আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে কতটা সক্ষম এবং তা গণমানুষের সংস্কৃতিকে ধারণ করে ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্মতি উৎপাদনে কতটা কার্যকর- সে বিতর্ক হতেই পারে। তবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য উপস্থাপনে এখনো গণমাধ্যম কার্যকরভাবেই ক্রিয়াশীল। বিশেষ করে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গণমানুষের কাছে অনুন্মোচিত নানা তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এটি প্রমাণিত যে, দুর্নীতি দমনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সরাসরি প্রভাব রয়েছে।[৮]

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে কেউবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতকার গ্রহণ, তথ্য যাচাই এবং গভীর গবেষণার অনুশীলন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। আবার কেউ অজানা বিভিন্ন সংযোগসমূহের যুগান্তকারী উন্মোচন হিসেবে দেখে থাকেন (ড্রেক ২০১৮)।[৯] অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হলো গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। শতাব্দীকাল ধরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও কর্পোরেট শোষণের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখছে (শিফরান ২০১৪)।[১০]

অনুসন্ধানী সংবাদিকতার ব্যাখ্যায় ইউনেস্কোর সংজ্ঞাটিই বহুল প্রচলিত। ইউনেস্কো 'স্টোরি-বেইজড এনকোয়ারি' নামের এক হ্যান্ডবুকে বলেছে, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনো হয়তোবা বিপুল ও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপন নানা উৎস (সোর্স) ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র।' আবার ডাচ-ফ্লেমিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সংঘ ভিভিওজে'র সংজ্ঞায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলতে সেসব প্রতিবেদনকে বোঝায়, যেগুলো 'বিশ্লেষণাত্মক ও কোনো একটি বিষয়কে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে'।[১১] কোনো কোনো সাংবাদিক অবশ্য মনে করেন, 'সব রিপোর্টিংই অনুসন্ধানমূলক'।[১২]

---

[১] https://www.u4.no/publications/media-and-corruption.pdf
[২] Weder, Beatrice and Brunetti, Aymo. A Free Press Is Bad News for Corruption. Journal of Public Economics, 2003. See: প্রাগুক্ত[১]
[৩] Färdigh, Mathias A., 2013: What's the Use of a Free Media – The Role of Media in Curbing Corruption and Promoting Quality of Government.
[৪] Oxford English Dictionary Online. 2008 Oxford University Press. 23, Jan 2008.
[৫] Plato, trans. Jowett, Benjamin, The Republic of Plato, Oxford: The Clarendon Press, 1947.
[৬] Adorno, Theodor W. "The Culture Industry Reconsidered," Media Studies: A Reader. New York: New York University Press, 1982.
[৭] Herman, Edward S.; Chomsky, Noam. Manufacturing Consent. New York: Pantheon Books,1988 book
[৮] Drüeke, Ricarda 2018: Medien, Öffentlichkeit und Demokratie: Zur Watchdog-Funktion von Medien. See: প্রাগুক্ত[১]
[৯] প্রাগুক্ত[১]
[১০] প্রাগুক্ত[১]
[১১] https://gijn.org/investigative-journalism-defining-the-craft/
[১২] Bruce, Itule and Douglas Anderson, News Writing and Reporting for Todas's Media, McGraw Hill, New York, U.S.A, 2007

এই প্রবন্ধে আমরা মূলত বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা, পেশাদারিত্ব এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জ খুঁজে দেখার পাশাপাশি করোনাকালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জের প্রভাব দেখতে চেয়েছি। প্রাসঙ্গিকভাবেই দেশে গণমাধ্যমের মালিকানা ও সাংবাদিকতার ধরণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে গণমাধ্যমের অবস্থান আলোচনায় এসেছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম:

দেশের অর্ধেক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজের টেলিভিশন কিংবা উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি না থাকা এবং পড়তে না জানার পরও ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে গণমাধ্যম ক্রমশ ব্যাপকতা পেয়েছে।[১৩] ১৯৯০ এর দশক থেকে যখন নতুন করে গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা ঘটে, তখন থেকেই বাংলাদেশের গণমাধ্যম-কাঠামো, বিষয়বস্তু, ব্যবহার ও মালিকানায় বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং বিশ্বায়নের অনস্বীকার্য প্রভাবে এদেশের গণমাধ্যমও প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়া নয়া উদারবাদী নীতিমালা বাংলাদেশকে মুক্ত অর্থনীতির দেশে পরিণত করায় সেখানে নয়া গণমাধ্যম তথা নিউ মিডিয়ার উত্থানের ফলে প্রতিযোগিতাও বেড়ে গেছে। ফলে বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেখা যায়।[১৪]

বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফ এম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রয়েছে। এছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র রয়েছে ১২৪৮টি এবং ১০০০টিরও বেশি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে। ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমান খাত হিসেবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ২৭ বিলিয়ন টাকার সমতুল্য এবং এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১০-১২ শতাংশ।[১৫] বাংলাদেশের গণমাধ্যমের চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে এদেশের গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব বিকাশের নানা দিক ও তার প্রভাব আলোচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় আলোচনার দাবি রাখে।

কর্পোরেট পুঁজি, সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা:

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের উত্থান বা প্রবৃদ্ধির সাথে গণমাধ্যমের ঝুঁকিপূর্ণ কর্পোরেটকরণ হয়েছে। এখাতে ব্যাপক কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশ যেমন ঘটেছে, তেমনি এই পুঁজির প্রভাব গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতিমালাকেও আচ্ছন্ন করেছে। সরকারি সিদ্ধান্তে এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় পারিবারিক নেটওয়ার্ক, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও কর্পোরেট কোম্পানীর স্বার্থে এসময় অধিকাংশ 'মিডিয়া আউটলেট'-এর উত্থান ঘটেছে। ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎ, রিয়েল এস্টেট ও অন্যান্য বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি ব্যবসায়িক গ্রুপের মালিকানাতেই অধিকাংশ গণমাধ্যম অনুমোদন পেয়েছে। এমনকি সরকারঘোষিত অনেক ঋণখেলাপিও গণমাধ্যমের মালিক বনে গেছেন । শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মালিকানাতেই ৭টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[১৬] নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দেশের ৩২টি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৪৮টি গণমাধ্যম রয়েছে। ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মালিক হিসেবে একই পরিবারের সদস্যরা একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারার রাজনীতির সাথেও যুক্ত। এতে করে ব্যাপক স্বার্থের দ্বন্দ এবং সেই স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে অভূতপূর্ব সরকার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দেশের একটি শীর্ষ ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক বলেন, *"মালিক যখন নির্ধারণ করে দেন সম্পাদক কী ছাপবেন কিংবা কী ছাপবেন না, প্রয়োজনে সম্পাদককে বাধ্য করা হয় কিংবা সম্পাদক রাজি না হলে তাকে তোয়াক্কা না করেই সংবাদ প্রকাশ করা হয়- তখন কি করে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবো? তার মানে হচ্ছে, পেশাদার সাংবাদিকতার নীতি কার্যকর থাকছে না। কার্যকর থাকছে না সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সত্য, মানুষের অধিকার, জনস্বার্থ, সামষ্টিক মঙ্গল, দুর্নীতি উন্মোচন, ন্যায়বিচারের সংগ্রাম, সমতা, ন্যায্যতা, ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনের মতো ধারণাগুলো। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতায় আনার যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গণমাধ্যম পালন করে, তা উধাও হয়ে যাচ্ছে। আর এর সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার ধারণাও।"*[১৭] এই বক্তব্য থেকেই দেশের গণমাধ্যমে পুঁজির অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশের প্রভাব স্পষ্ট।

অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানই তাদের মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা ঢাল হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার অনেকেই সরকারের সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তকে ঢালাওভাবে সমর্থন করে থাকে।[১৮] কেউ কেউ এটা বিজ্ঞাপন প্রাপ্তি কিংবা 'টিকে থাকা'র চিন্তা থেকে করলেও অধিকাংশরাই বর্তমানে 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' কাঠামোর অংশ হিসেবেই করে থাকে। দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত এই প্রবণতার ধারাবাহিকতায় টানা তিন মেয়াদে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের শাসনামলে মিডিয়ার ব্যাপারে সরকারের চাহিদা, প্রচারিত ভাষ্যের ধরণ এবং তা অনুসরণ না করার ফলে রোষের উদাহরণ বিবেচনায় নিয়ে অধিকাংশ মিডিয়াই নিরাপদ সাংবাদিকতার পথ বেছে নিয়েছে। এতে সম্পাদকীয় নীতিমালা ছাড়িয়ে মাঠ প্রতিবেদকের কাছেও এই 'সেল্ফ সেন্সরশিপ' কাঠামো পরিচিত ও অবশ্য পালনীয় বিবেচ্য হচ্ছে। এতে করে সরকারের কঠোর নজরদারিরও প্রয়োজন পড়ছে না।[১৯] তাই

[১৩] Aminuzzaman, Salahuddin M. and Khair, Sumaiya, Governance and Integrity: The National Integrity Systems in Bangladesh, The University Press Limited (UPL), 2017

[১৪] Riaz, Ali and Rahman, Mohammad Sajjadur, Who Owns the Media in Bangladesh?, Center for Governance Studies, 2021

[১৫] প্রাগুক্ত

[১৬] প্রাগুক্ত[১৪]

[১৭] https://bit.ly/3rol47D

[১৮] প্রাগুক্ত[১৩]

[১৯] https://www.bbc.com/bengali/news-57273644

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের উপর বহিস্থঃ নানা চাপ এবং শক্তিশালী বিভিন্ন প্রভাব বলয়ের মাঝে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল।[২০]

অনেকসময়ই সরকারের তরফ থেকে গণমাধ্যমের উপরোল্লিখিত উল্লম্ফনকে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আদতে এসময় যেসব গণমাধ্যম অনুমোদন পেয়েছে তার অধিকাংশই ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের পাশাপাশি সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি সরকারও নানা আইনি ও আইন বহির্ভূত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। অন্তত ২০টি আইন, আইনের ধারা ও নীতিমালা মিডিয়ার ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সরাসরি সহায়তা করে থাকে।[২১]

সাংবিধানিকভাবে মত প্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করা হলেও বাংলাদেশের বেশকিছু নিয়ন্ত্রণধর্মী আইন সরাসরি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিপন্থী। আবার অনেক আইনের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের মধ্য দিয়ে সংবিধানপ্রদত্ত স্বাধীন মত ও চিন্তার প্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়েছে এভাবে যে– *'এই স্বাধীনতা, আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ তথা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধে প্ররোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না'*।[২২]

বিদেশি গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাতকারে শীর্ষস্থানীয় একটি ইংরেজী গণমাধ্যমের সম্পাদক বলেন, *"এখন খবরের কাগজের সংখ্যা বাড়ার ফলে মালিকদের সংখ্যাও বেড়েছে। তবে এই মালিকরা অনেকেই সংবাদপত্রের আদর্শে অতটা বিশ্বাস করেন কিনা বলা মুশকিল।"* তিনি বলেন, *"সংবাদপত্রকে ব্যবসা হিসেবে চালানোর পরেও তো সংবাদপত্রের আলাদা ধরন আছে! আলাদা নীতিগত প্রয়োজনীয়তা আছে! এটা ওনারা মানেন কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ আছে।"* গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়ে তিনি বলেন, *"সামগ্রিকভাবে এখন একটা পরিবর্তনশীল পরিবেশ। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা আগের থেকে এগিয়ে আছি। আবার কতগুলো বিষয়ে পিছিয়ে আছি, বিশেষ করে আইনগতভাবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংঘাতিকভাবে মুক্ত সাংবাদিকতার পরিপন্থী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা উপভোগ করছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে করছি না, এটা এক ধরনের মিশ্র পরিবেশ।"*[২৩]

গণমাধ্যম ও মালিকপক্ষের মধ্যকার এই দ্বন্দ শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের সব দেশেই মোটামুটি বিদ্যমান। জেনকভ, ম্যাকলেইশ, নেনোভা এবং শে-ইফার ২০০১ সালে বিশ্বের ৯৭টি দেশে গণমাধ্যমের মালিকানার ধরণগুলোর উপর একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেখানে তারা দেখান যে, মালিকদের স্বার্থের গণ্ডি দিয়ে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের স্বায়ত্তশাসনের সীমানা রচিত হয়। বেসরকারি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যাদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে বাণিজ্যিক প্রসার সেসব গণমাধ্যমের আধেয়ের প্রধান লক্ষ্য মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের তুষ্টি সাধন।[২৪]

বাংলাদেশে বৈশ্বিকভাবে পরিচিত 'গণমাধ্যম জবরদখল' (Media Capture)-এর তীব্র প্রকাশ দেখা যায়– বার্লিনের হেটি স্কুল অব গভর্ন্যান্সের ডেমোক্রেসি স্ট্যাডিজের অধ্যাপক অ্যালিনা মুঙ্গিউ পিপ্পিডি যাকে এমন একটা পরিস্থিতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে গণমাধ্যম তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করছে না বা তার দায়িত্ব পালনে, যেমন– জনগণকে সঠিক সংবাদ বা তথ্য জানাতে ব্যর্থ হচ্ছে। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে নিজেই কায়েমি স্বার্থের অংশ হয়ে উঠেছে এবং ক্ষমতাসীনদের পাশাপাশি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে।[২৫]

২০২০ সালের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে ১৮০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ১৫২তম অবস্থান এবং সর্বশেষ বিশ্ব মতপ্রকাশ প্রতিবেদনে ১৬১টি দেশের মধ্যে ১৩২তম অবস্থান দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নাজুক পরিস্থিতি প্রমাণ করে। বিশেষ করে, গত এক দশকে এই দুই সূচকেই বাংলাদেশের নিম্নক্রমে স্থির অবস্থান কিংবা ক্রমাবনতি পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টের ' গ্লোবাল ইমপিউনিটি ইনডেক্স'-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১১ এবং বিগত একযুগে অন্তত ১১ জন সাংবাদিক নিহত হলেও তার অধিকাংশেরই বিচার বছরের পর বছর ঝুলে আছে।[২৬] এসময় সাংবাদিকদের সুরক্ষায় কোন ধরণের আইনী বা নীতিকাঠামো তৈরি করা হয়নি।

পেশাদারিত্ব, অভ্যন্তরীন স্বচ্ছতা ও সুশাসন এবং সুযোগ-সুবিধা:

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলোর মধ্যে ডেনিয়েল সি. ঘালিন ও পাওলো মানচিনির (২০০৪) তত্ত্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমের ১৮টি দেশের তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে হালিন ও মানচিনি বলেছেন, *'একটি দেশের গণমাধ্যম কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তা দেখার জন্য চারটি চলক*

---

[২০] প্রাগুক্ত[১৩]
[২১] প্রাগুক্ত[১৩]
[২২] প্রাগুক্ত[১৩]
[২৩] https://bit.ly/3rr26oo
[২৪] https://bit.ly/3roRlvx
[২৫] Mungiu-Pippidi 2013, 41
[২৬] https://bit.ly/31jwiPH

বিশ্লেষণ করতে হয়। সেগুলো হলো– গণমাধ্যমের বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে গণমাধ্যমের সম্পর্ক, সাংবাদিকতার পেশাদারিত্বের উন্নয়ন এবং গণমাধ্যম ব্যবস্থার ওপর রাষ্ট্রের খবরদারির মাত্রা ও প্রকৃতি। এই চলকগুলো পরস্পর সম্পর্কিত। এগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই।'[২৭]

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ম্যাস-অডিয়েন্স বা ম্যাস-সার্কুলেশন গড়ে না উঠা, সাংবাদিকদের পেশাদারিত্বের উন্নয়ন না হওয়া, বিজ্ঞাপনদাতা, মালিক ও রাষ্ট্রীয় চাপ বেড়ে যাওয়া, এবং সর্বোপরি গণমাধ্যম স্বাধীনতার সূচকের মান ক্রমশ নিম্নগামী হওয়ার কারণগুলোকে একবিন্দুতে স্থাপন করা যায়। সেটি হলো, গত তিন দশকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া 'পলিটিক্যাল প্যারালালিজম'-এর বিবর্তন। হালিন ও মানচিনির 'পলিটিক্যাল প্যারালেলিজম'টি বাংলাদেশে নব্বই সালের পর 'কর্পোরেট-কাম-পলিটিক্যাল ক্লায়েন্টিলিজম'-এ রূপ নিয়েছে। ৯০ দশকের পর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে বহু গণমাধ্যম গড়ে উঠলেও এবং এর বাজার বহুগুন সম্প্রসারিত হলেও এখনো গণমাধ্যমের পেশাদারিত্ব নিশ্চিত হয় নি।[২৮]

অভ্যন্তরীন পেশাদার চর্চা ও সুশাসনের অভাব, সঠিক মানবসম্পদ নীতি, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ঘাটতি, কর্মীদের অসম ও অনির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা এই অবস্থাকে আরো সঙ্গীন করেছে। দেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিম্ন ও মধ্যমসারির কর্মীদের জন্য আকর্ষণীয় বেতনকাঠামো না থাকায় গণমাধ্যমে অভ্যন্তরীন দুর্নীতি এবং প্রভাব বিস্তারের মত ঘটনা দেখা যায়। এছাড়াও সাংবাদিকের স্বল্প বেতনের অনুঘটক হিসেবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা স্বার্থের দ্বন্দে প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।[২৯]

বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে সার্বজনীন কোন মানবসম্পদ নীতিমালা নাই। বরং একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে পরিচালিত হয়। এমনকি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত গণমাধ্যমের সাথে তার 'মাদার কোম্পানী'র মানবসম্পদ পরিচালনা পদ্ধতি ও চর্চা এবং সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক ঘাটতি দেখা যায়। সাংবাদিকতার পেশাদারিত্ব তৈরি না হওয়ায়– বিশেষ করে, টেলিভিশন সাংবাদিকতায় 'ঝড়ে পড়া'র হার অনেক বেশি। এখনও অনেকেই সাংবাদিকতা করতে আসে স্রেফ ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে। আবার অনেকে পরিচয় ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের জন্যও সাংবাদিকতায় আসে এবং কম বেতনেও টিকে থাকতে চায়। এখানে পেশাদারি আগ্রহ তৈরি হয় নি। মানবসম্পদ নীতিমালা এবং নিয়োগ, স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি যথাযথ নিয়ম অনুসারে না হওয়ায় ব্যক্তিগত আগ্রহ বা মোহ কেটে গেলে অনেকেই সাংবাদিকতা ছেড়ে দেয়। এখনও প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও সাংবাদিকতাকে আলাদা করা যায় নি।[৩০]

চাকরি প্রদান কিংবা চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা অনুসরণ না করায় বাংলাদেশে গণমাধ্যমের চাকুরি নির্ভর করে নিয়োগকর্তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'ই এখানে অঘোষিত নীতিমালা! তাই অন্যায্যভাবে কেউ বরখাস্ত হলে বা যোগ্য পদোন্নতি না পেলে তার কোন অভিযোগের জায়গা থাকে না। এক্ষেত্রে সাংবাদিক সংগঠনগুলোও কিছু ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ সময়ই নিশ্চুপ থাকে। আবার নিয়োগকর্তা বা উর্ধ্বতন সহকর্মীর সাথে মতের অমিল হলে এমনকি যৌন হয়রানির মত অভিযোগ দিলেও অভিযুক্তের বদলে অভিযোগকারীর চাকুরি চলে যাওয়ার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলেও এমন ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৩১] এক গবেষণায় দেখা যায়, কর্মস্থলে নারী সাংবাদিক যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার পর ৮৫ শতাংশেরও বেশি কোন প্রতিকার পাননি।[৩২]

সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা এবং পেশাগত সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট ও একক কোন নীতি-কাঠামো না থাকায় পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা আজও পেশাদারি অবস্থান তৈরি করতে পারে নি। স্বজনপ্রীতি তাই এখানে অসম্ভব কোন গল্প নয়। এসব কারণে অনেকেই যতটা আগ্রহ নিয়ে সাংবাদিকতায় আসেন, ততটাই হতাশ হয়ে পেশা ত্যাগ করেন কিংবা করতে বাধ্য হন। এসবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শুধু চ্যালেঞ্জিং পেশাই নয়, বরং আত্মোৎসর্গকৃত পেশা হিসেবেই দেখা হয়।[৩৩]

তবে সাংবাদিকতা কোন 'স্বর্গীয় পেশা' নয় মন্তব্য করে ছাটাইকে পেশাগত ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই অনেকে দেখে থাকেন। বিশেষ করে, যথাযথ প্রশিক্ষণ, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, পরিশ্রম কিংবা কাজের প্রতি নিষ্ঠা বিবেচনায় অনেকেই সাংবাদিকতায় উন্নতি সম্ভব বলে মনে করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং মানোন্নয়নের ঘাটতি বিদ্যমান থাকায় আত্মোন্নয়নের এ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।[৩৪]

বাংলাদেশে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সার্বিকভাবে স্বচ্ছতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয় এবং বিনিয়োগের উৎস যেমন উন্মুক্ত নয়, তেমনি অভ্যন্তরীন কর্মী, প্রতিবেদন এবং সম্পাদকীয় নীতিমালাও সর্বসমক্ষে সহজলভ্য নয়।

---

[২৭] হাতির অদৃশ্য দাঁত ও গণমাধ্যমের মালিক, মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী, ডয়েচে ভেলে, ৭ মে ২০২১। see: https://bit.ly/3roRlvx

[২৮] প্রাগুক্ত

[২৯] প্রাগুক্ত৩০

[৩০] চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুনের একান্ত সাক্ষাতকার, ২০২১,

[৩১] নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গণমাধ্যমকর্মীর একান্ত সাক্ষাতকার, ২০২১

[৩২] চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, পেশাদার সাংবাদিকরা চাকরি কতটা সন্তুষ্ট? একটি গবেষণা মূল্যায়ন, বাংলাদেশ প্রেস ইন্সিটিউট, ২০১৭

[৩৩] https://www.researchgate.net/publication/343756089_Safety_Measures_of_Journalists_during_Corona_Pandemic_in_Bangladesh

[৩৪] চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুনের একান্ত সাক্ষাতকার, ২০২১

গণমাধ্যমের উচ্চ পরিচালন ব্যয় নির্বাহে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীলতা গণমাধ্যমের অভ্যন্তরীন সুশাসন ও স্বচ্ছতাকে আরো দূর্বল করেছে।[৩৫]

বাংলাদেশে গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত সন্তুষ্টি

এটা খুবই সাধারণ একটি বিষয় যে যদি কোন পেশাজীবি তার পেশাগত জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহলে তার দ্বারা মানসম্মত কাজ হওয়া কঠিন। সাধারণভাবে চাকরির সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা ও ব্যক্তিগত মঙ্গলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। কারণ চাকরির সন্তুষ্টি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে তুষ্টি আনে, তাদের উদ্যম বাড়ায়, এটি তাদের কর্মের স্বীকৃতি দেয়।[৩৬]

গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত সন্তুষ্টি নিয়ে পিআইবি থেকে প্রকাশিত একটি গবেষণা গ্রন্থে[৩৭] ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। বিশেষ করে, সংবাদপত্র, অনলাইন এবং টেলিভিশন মিডিয়ার কর্মীদের মতামতে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা টেলিভিশন সাংবাদিকদের তুলনায় তাদের বর্তমান চাকরি নিয়ে বেশি সন্তুষ্ট। আর অনলাইন সংবাদ মাধ্যমে অসন্তুষ্টির হার সবচেয়ে কম। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের চাকরি নিয়ে অসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে চাকরির নিরাপত্তার অভাবই মুখ্য কারণ। আর এর কারণ হিসেবে যথাযথ চাকরিবিধি না থাকাকেই দায়ী করেছেন সাংবাদিকরা।

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত সাংবাদিকদের মধ্যে প্রায় ৫৪ ভাগ নিজের ইচ্ছা কিংবা পছন্দে এই পেশা বেছে নিয়েছেন। মর্যাদাকর পেশা ভেবে কাজে যোগদান করেছেন প্রায় ৩২ ভাগ সংবাদকর্মী। কর্মপরিবেশ নিয়ে 'সন্তোষজনক' মত দিয়েছেন ৩৬ ভাগ সাংবাদিক এবং 'উপযোগী' বলেছেন ২৬ ভাগ সাংবাদিক। 'অসন্তোষজনক' বলে মত দিয়েছেন ১৩ ভাগ সাংবাদিক। 'সন্তোষজনক' না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি অন্যতম। অন্যদিকে, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক না হওয়ার হার বেশি।

কর্মরত সাংবাদিকদের ৫৭ ভাগ মনে করেন তারা অতিরিক্ত কাজ করেন। প্রায় ৩১ ভাগ সাংবাদিক মনে করেন তারা যে বেতন পাচ্ছেন তা দিয়ে ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন এবং প্রায় সমসংখ্যক মনে করেন যোগ্যতার তুলনায় তাদের বেতন কম। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রায় ৩৩ ভাগ কর্মী মনে করেন ম্যানেজমেন্টের সুদৃষ্টি এবং প্রায় ৩১ ভাগ মনে করেন সম্পাদক ও সুপারভাইজারের সুদৃষ্টি পদোন্নতির অন্যতম কারণ। গণমাধ্যমে ভালো কাজের জন্য প্রণোদনা দেবার প্রবণতা নেই বলে মনে করেন প্রায় ৮০ ভাগ কর্মী। সংবাদপত্রে কাজ করা ৫৭ ভাগ সাংবাদিক ওয়েজবোর্ড অনুসরণ করার কথা বলেন। আর আংশিক অনুসরণ করার কথা জানান ৩১ ভাগ সাংবাদিক। কর্মস্থল পরিবর্তনের কথা চিন্তা-ভাবনা করেন প্রায় ৬৫ ভাগ সাংবাদিক। টেলিভিশন ও রেডিও'র ক্ষেত্রে কর্মস্থল পরিবর্তনের প্রবণতা বেশি।

পেশাগত সন্তুষ্টি নিয়ে এই গবেষণায় তথ্য অনুযায়ী, গণমাধ্যমকর্মীরা তাদের পেশা নিয়ে অসন্তুষ্টির কারণে একধরণের হতাশা ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। যা তাদের কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ নষ্ট করে। সাম্প্রতিক সময়ে অধিকাংশ সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের অনলাইন ভার্সন থাকায় অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই একই বেতনে অতিরিক্ত সময় ও শ্রম ব্যয় করে তার কর্মীদের নিয়মিত কাজের অতিরিক্ত অনলাইন মাধ্যমের জন্যও কাজ করতে বাধ্য করেন। সাম্প্রতিক এই প্রবণতা সাংবাদিকদের জন্য আরেক ধরণের চাপ তৈরি করেছে এবং তাদের পেশাগত অসন্তুষ্টি আরো বাড়িয়ে তুলছে।[৩৮]

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাঃ

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ও জনপরিসরে এর গ্রাহক ভিত্তি তৈরি হলেও তুলনামুলকভাবে মানসম্মত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রসার হয়নি। কয়েক বছর আগের তুলনায় এখন অধিকসংখ্যক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচার হলেও বৈশ্বিক মানদন্ডে তা কতটা মানোত্তীর্ণ তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশেষ করে লিক সাংবাদিকতা, একসূত্র নির্ভর সাংবাদিকতা, পাপারাজ্জি সাংবাদিকতা, সরাসরি নথি চুরি কিংবা কোন কর্মকর্তা-কর্মচারির ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনে অন্য কোন কর্মকর্তার দুর্নীতি-অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি কিংবা প্রতিদিনকার সাংবাদিকতাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হিসেবে প্রচারের মত নানাবিধ প্রয়াস দেখা গেলেও দীর্ঘদিনের গবেষণায় অনুন্মোচিত কোন জনস্বার্থ বিষয়ক ইস্যু উন্মোচনের মত প্রতিবেদনের ঘাটতি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. আলী রিয়াজ বলেন, "প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো এখনও গড়ে উঠতে পারেনি। এটিও আমাদের দেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অনুপস্থিতির অন্যতম একটি কারণ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম মালিকরা অন্যান্য ব্যবসার সাথে যুক্ত। অপরাপর ব্যবসার স্বার্থে অনেকে সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ফলে ভালো সংবাদপত্রের যেসব চাহিদা সেগুলো এবং সংবাদপত্রের যে সামাজিক ভূমিকা সে বিষয়ে কোনো উৎসাহ মালিকদের ভেতর লক্ষ্য করা যায় না।"[৩৯]

---

[৩৫] প্রাগুক্ত[১৩]

[৩৬] Kaliski, B.S. Encyclopedia of Business and Finance, Second edition, Thompson Gale, Detroit, 2007.

[৩৭] প্রাগুক্ত[৩২]

[৩৮] ব্যক্তিগত একক সাক্ষাতকার, ২০২১

[৩৯] উদ্ধৃত- ফেরদৌস, রোবায়েত; চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং হক, সাইফুল, দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।

প্রশ্ন হলো, কেনো বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঠিক চর্চার ঘাটতি বিদ্যমান? এখানে কি শুধুই মালিকপক্ষের কর্পোরেট পুঁজির সুরক্ষার বিষয়টি দায়ী, নাকি আরো অন্যান্য অনুসঙ্গও অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে? এ প্রশ্নে উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা বেশ কয়েকটি টেলিভিশন ও পত্রিকার উর্ধ্বতন কর্তা, উচ্চ ও মধ্যম সারির সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। পাশাপাশি বেশ কিছু গবেষণা/মন্তব্য প্রতিবেদন অধ্যয়ন করে দেখেছি যে, সংবাদের সাথে বিজ্ঞাপনের যৌথ অংশীদারিত্ব, সংবাদের ভেতরের স্বার্থ হাসিলে সক্ষম মতামতের অনুপ্রবেশ, কোন কোন ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীর ঐকান্তিকতার অভাব সবমিলিয়ে খবরের পাতা কিংবা টিভি পর্দায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অপ্রতুলতা দেখা যায়। পাশাপাশি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসজ্জা ও ট্রিটমেন্ট এবং টেলিভিশন বুলেটিনের রান-ডাউন (সংবাদ ধারাক্রম) সবটাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ধনতন্ত্রের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠা বিজ্ঞাপনের ইশারায়। যদিও অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে বিজ্ঞাপনকে সাথে নিয়েই গণমাধ্যমকে চলতে হবে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের ভারে ও চাপে সাংবাদিকতার শুদ্ধ ও স্বাভাবিক পথচলায় বিঘ্ন ঘটলে তা অশনিসংকেত। আবার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানও নিজ থেকে অনেকক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির অবতারণা করে যেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ব্যহত হয়।[৪০]

এখানে এখনো প্রতিবেদকের ব্যক্তি উদ্যোগে ভালো ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার হলেও বৈশ্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় এখনো জোটবদ্ধ বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে কোন একটি বিষয়ে একযোগে অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরির সংস্কৃতি গড়ে উঠে নি। অথচ পানামা পেপারস (২০১৬), প্যারাডাইস পেপার (২০১৭), প্যান্ডোরা পেপারসের (২০২১) মত বিশ্বের সাড়া জাগানিয়া বড় বড় সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়েছে দীর্ঘদিনের যুথবদ্ধ প্রয়াসে। আর এর সবকটিই আইসিআইজের কনসোর্টিয়ামের দীর্ঘদিনের যৌথ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফসল। যা বাংলাদেশে অলীক কল্পনামাত্র। এখানে এমনকি কয়েকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান মিলে একসাথে একটি বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধান ও গবেষণা করে একযোগে প্রতিবেদন প্রকাশের মত সুযোগও তৈরি হয় নি। বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও স্বার্থের দ্বন্দে অনেক অনুসন্ধান বন্ধ হয়েছে, প্রতিবেদন প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বর্তমানে দুর্নীতি বিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বৃদ্ধি পেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা শুধু ঘটনার প্রকাশের মধ্যেই আটকে থাকে। খুব কম প্রতিবেদনেই সংঘটিত দুর্নীতির লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণ থাকে। অনেকসময় কোন ধরণের ফলোআপ ছাড়াই খাপছাড়া ও খন্ডখন্ডভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। কিছু বিশেষ দৃষ্টান্ত ছাড়া সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতায় সংঘটিত দুর্নীতির বিষয়ে খুব কমই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার করতে দেখা যায়।[৪১] তবে এক্ষেত্রে অনেকেই সরকারের কর্তৃত্ববাদী প্রভাব এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা বিরোধী নানা আইনী কাঠামোর অভিযোগ করে থাকেন।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ:

বিগত দশকে দেশে অনেক ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদাহরণ আছে। টিআইবির অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রতিযোগিতায় প্রতি বছরই বিগত বছরের তুলনায় মানসম্মত ও অধিকসংখ্যক প্রতিবেদন জমা পড়া তার একটি উদাহরণ হতে পারে। বর্তমানে টিআইবির মত আরো বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধানী সংবাদিকতা বিষয়ক গভীর প্রশিক্ষণ, তদারকিকরণ ও তথ্য সরবরাহের সাথে যুক্ত হয়েছে। আবার অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানও আগের তুলনায় তার প্রতিবেদকদের অনুসন্ধানে উৎসাহিত করছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই আলাদাভাবে অনুসন্ধানী সেল গঠন করা হয়েছে। টেলিভিশনগুলোতে আলাদা করে অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা কাজ করছে। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ভালো কিছু প্রতিবেদনও প্রকাশ ও প্রচার হয়েছে। এছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও এর নানা ধরণ সম্পর্কে প্রচুর সাংবাদিক জানতে, শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতটুকুই কি যথেষ্ট? গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ কাঠামো, দায়িত্বশীলদের যোগ্যতা, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও সময়, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ কিংবা প্রচারে প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ কিংবা সামর্থ্য, আইনী-রাজনৈতিক ও সরকারি নানা চাপ ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ কতটা সংকুচিত করছে সে বিষয়টিও দেখার সুযোগ আছে।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জঃ

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলাপ করতে গেলে মোটা দাগে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে। প্রথমত, নিয়ন্ত্রিত বাজার ও কর্পোরেট পুঁজির প্রভাব। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনী ও নীতিকাঠামো। তৃতীয়ত, সেল্ফ সেন্সরশিপ। চতুর্থত, প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছার ঘাটতি। পঞ্চমত, সক্ষমতার ঘাটতি। ষষ্ঠত, নিরাপত্তাহীনতা।

কর্পোরেট পুঁজি ও নিয়ন্ত্রিত বাজার

এই প্রবন্ধের শুরুতেই গণমাধ্যমে কর্পোরেট পুঁজির প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে জনৈক কিশোরীর হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে একটি মিডিয়া গ্রুপ এবং ব্যবসায় গোষ্ঠীর এমডির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর তার মালিকানাধীন মিডিয়া তো বটেই এমনকি অন্যান্য মিডিয়াও কর্পোরেট পুঁজির চাপে নিশ্চুপ ছিলো। পরে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা জনগণের আগ্রহের চাপে বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে নিউজ করলেও

[৪০] ফেরদৌস, রোবায়েত; চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং হক, সাইফুল, দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৫।
[৪১] প্রাগুক্ত[১৩]

বিপরীতে নিহতকেই চরিত্রহীন লোভী আখ্যা দিয়ে তার মৃত্যুর বিষয়টিকে স্বাভাবিক হিসেবে প্রকাশের চেষ্টাও লক্ষ করা গেছে। আবার যেসমস্ত গণমাধ্যম এঘটনায় তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার করেছিলো সেসব প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন প্রদান বন্ধ করে দেওয়ায় সেগুলো আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশে মিডিয়ার বাজার এখন ছোট হয়ে আসায় অনেক ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানী কাজের সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। এভাবেই কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণে বহু সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার হয় নি, এমনকি শুরুই করা যায় নি। কর্পোরেট দুর্নীতি বা অনিয়ম বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তেমন একটা চোখে পড়ে না, যতক্ষণ না কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা আদালত কর্তৃক সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমলে নেয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এটাও হয় মুলতঃ সাময়িক সংযুক্তি ও বিযুক্তি মডেলে। অর্থাৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়লে তখন মিডিয়ার সাথে তার সাময়িক বিযুক্তি তৈরি হয় এবং আবার বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে কিংবা উদ্ধার প্রক্রিয়ায় অনেকক্ষেত্রেই মিডিয়ার সাথে পুনরায় সংযুক্তি তৈরি হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় আইনী ও নীতিকাঠামো

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের মালিকানা মুলতঃ রাজনৈতিক বিবেচনায় পুঁজিপতিদের কাছে। গণমাধ্যমের লাইসেন্স প্রাপ্তি নির্ভর করে সরকারের সাথে উদ্যোক্তার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। আবার রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই হন গণমাধ্যমের মালিক কিংবা ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে লাইসেন্স পাইয়ে দিতে তদবির করে থাকেন। কখনোবা ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সাথে যারা জড়িত, তাদের হাতে গণমাধ্যমের মালিকানা হস্তান্তর ঘটে থাকে। বিগত দশকের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্সপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া কিংবা হস্তান্তরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে তা খুব সহজেই বোঝা যায়।[৪২]

খুব স্বাভাবিকভাবেই এ প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিসংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যদিও এর মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক নানা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলো ততটুকু পর্যন্তই হয়, যতটুকু হলে সরকার তা সামাল দিতে পারবে কিংবা তার বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়বে না। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে কিংবা নিজের 'রাজনৈতিক মূল্য' তৈরি করতেও রাজনীতি সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষ গণমাধ্যমের ব্যবহার করে থাকেন। এতে করে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা অনুসন্ধানী কোন প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার হলেও তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। বিশেষ করে, রাষ্ট্র যখন কোন বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে কোন গ্রাহ্যই করে না এবং তার 'গ্রহণ করে নেয়া'র ক্ষমতা বেড়ে যায়, তখন সেই প্রতিবেদনের কোন মূল্যই আর থাকে না। যেমন, একজন এমপির কানাডার বেগমপাড়ায় বাড়ি এবং দেশে আরো বিলাসবহুল সম্পদ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পরও যখন সেই এমপিকে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয় না, তখন সেই প্রতিবেদনের আর কোন মূল্যই থাকে না। এভাবে রাজনৈতিক কারণেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রভাব হ্রাস পায়।[৪৩]

অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় নানা আইনী ও নীতিকাঠামো বর্তমানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এসব আইন যেকোন সময় যে কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ব্যবহারের হুমকি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, অফিসিয়াল সিক্রেটস আইন ১৯২৩, এমনকি পেনাল কোড ১৮৬০ এর বিভিন্ন ধারাও অনুসন্ধানী সাংবাদিকদেও বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদাহরণ আছে। এসব আইনে ব্যক্তির মানহানি, মিথ্যা তথ্য প্রকাশ, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন কিংবা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বিবেচনায় মামলা করার সুযোগ আছে। আবার তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ বেড়েছে ভাবা হলেও এ আইনের কিছু সীমাবদ্ধতায় তা ব্যাপক ব্যবহারের সুযোগ সীমিত। [৪৪]

সেল্ফ সেন্সরশিপ

বিগত বছরগুলোতে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর সেল্ফ সেন্সরশিপ ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের বিধিনিষেধ না থাকলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই নিজের মত করে সরকার, রাজনৈতিক দল কিংবা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন প্রতিবেদন গুম করে দেন কিংবা কাঁটছাট করে প্রকাশ করেন। গত কয়েক বছরে এমন পরিবেশের কারণে অনেক জ্যেষ্ঠ অনুসন্ধানী সাংবাদিক তাদের পেশা বদল করে অন্য সেক্টরে চলে গেছেন। তেমনই একজন সিনিয়র সাংবাদিক বিবিসিকে বলেন, *"যা করে এসেছি অনুসন্ধানে, অন্ততপক্ষে সেইটুকুও যদি কোথাও না করতে পারি বা ওইটুকুও যদি পরিবেশ না পাই তাহলে কোথাও চাকরি করে লাভটা কী?"* সাংবাদিকতার বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে তরুণ সংবাদকর্মীদের মধ্যে একটা মানসিকতা তিনি লক্ষ্য করছেন যেটা তার ভাষায় আতঙ্কের। তিনি বলেন, *"ইয়াং জার্নালিস্টদের ক্ষেত্রে যেটা আতঙ্কের বিষয় সেটা হচ্ছে সেলফ সেন্সরশিপ। তারা ধরেই নিয়েছে যে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করাই যাবে না। ওই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আমি রিপোর্ট করি সেটা আমার সময় নষ্ট এবং আমার জীবনের জন্যও ঝুঁকি হতে পারে। সুতরাং তারা যখন চিন্তাভাবনা করে কোনো রিপোর্ট নিয়ে, তারা অনেকগুলো বিষয় বাদ দিয়েই চিন্তা করে।"*[৪৫] এ থেকে বোঝা যায় যে, হাউজ পলিসি নামক অদৃশ্য

---

[৪২] প্রাগুক্ত[১৪]

[৪৩] একান্ত সাক্ষাতকার, চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুন, ২০২১

[৪৪] প্রাগুক্ত[১৩]

[৪৫] https://www.bbc.com/bengali/news-57273644

সেন্সরশিপের বেড়াজালে সাংবাদিকদের অনেকেই এখন নিজে থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করার চিন্তা বাদ দেন এবং পলিসির বাইরে গিয়ে কখনও করেও ফেলেন সেটা আর প্রকাশ বা প্রচার হয় না।

প্রতিষ্ঠানের অনীহা ও ইচ্ছার ঘাটতি

প্রতিষ্ঠান যদি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চায়, তাহলে অনেক বিষয়েই অনুসন্ধান সম্ভব। কিন্তু সংবাদের বিভিন্ন আধেয়কে যখন 'পণ্য' হিসেবে দেখা হবে এবং তা কতটা 'বিক্রি হবে' বা 'পাবলিক খাবে' এই চিন্তা আসে, তখন আসলে কম খরচে বেশি লাভের প্রত্যাশা থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাদা হাতির পিছনে না ছুটে চটকদার শিরোনাম আর চিত্রে প্রাত্যহিক ঘটনাবলী বা 'ডেইলি ইভেন্ট' কাভার করাকেই অনেক প্রতিষ্ঠান সাশ্রয়ী মনে করে। এতে করে তার খরচ কমানোর পাশাপাশি অধিক বিজ্ঞাপনে অধিক আয় করার সুযোগ তৈরি হয়। এতে করে একদিনে যতটুকু করা যায়, ততটুকুই যথেষ্ট হিসেবে দেখা হয়। আবার অনেক সময় গা বাঁচিয়ে চলার চিন্তা থেকেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহ কমে যায়। এতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যেমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে তেমনি এর সুযোগও কমে আসে।

মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখন হুমকির মুখে। এ ব্যাপারে এক নিবন্ধে একজন সম্পাদক লিখেন যে, *" স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমরা অনেকেই এই কাজে ব্যর্থ হয়েছি। মালিকের জনসংযোগ কর্মকর্তার ভূমিকা পালন করে আমরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছি। আমরা অনেকেই আমাদের পদাধিকার ব্যবহার করে ধনী ও শক্তিমানদের কাছ থেকে অনুগ্রহ আদায় করেছি, প্রভাবের বিনিময়ে ব্যক্তিগত অর্জন পেয়েছি, নিজ অবস্থানের অপব্যবহার করে অন্যদের ক্ষতি করেছি এবং প্রকৃত সত্যটি জানা সত্ত্বেও সুবিধাজনক রাজনৈতিক পক্ষের সঙ্গে থাকার জন্য তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছি।"*[৪৬]

সক্ষমতার ঘাটতি

মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য যে পরিমান লজিস্টিক ও অন্যান্য সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন তার অভাব আছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন মাধ্যমে দেখা যায় যে, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে ভুগছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নীতি বিশ্লেষণ এবং দুর্নীতির অনুসন্ধানে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি, যোগ্য কর্মীর অভাব, যথাযথ প্রশিক্ষণের ঘাটতি, বিজ্ঞাপনী আয় সংগ্রহে প্রতিকুলতা, উচ্চ পরিচালন ব্যয়, সাংবাদিকদের অপর্যাপ্ত মজুরী এবং সীমিত লাভের কারণে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।[৪৭]

পাশাপাশি এখাতে পেশাদারিত্ব গড়ে না ওঠায় পরস্পরের সাথে যোগাযোগের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিযোগিতার কারণে এখানে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের মত 'জোটবদ্ধ সাংবাদিকতা'র সুযোগ তৈরি হয় নি। বিশেষ করে, দুর্নীতি বা অনিয়ম অনুসন্ধানে আইসিআইজের মত একজোট হয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান মিলে অনুসন্ধানের সক্ষমতা কিংবা বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে উঠে নি। যেমন অতিসম্প্রতি 'ফিনসেন ফাইলস' অনুসন্ধানে আইসিআইজের নেতৃত্বে ১০৮টি গণমাধ্যমের ৪০০ জন সাংবাদিক মাঠে নামেন। জোটবদ্ধ এই অনুসন্ধান প্রকল্পে ভারত, পাকিস্তান এবং এমনকি নেপালের গণমাধ্যমগুলোও কাজ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যমের উপস্থিতি ছিল না। আমাদের দেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখনো "ওল্ড ফ্যাশন্ড", অর্থাৎ পুরানো ধাঁচের। জুতোর তলা ক্ষয় করে সোর্সের কাছ থেকে নথি বের করা, মাঠে মাঠে ঘুরে সরেজমিনে চিত্র তুলে আনা, সেগুলোকে জুড়ে একটি গল্প তৈরি করার এই ধাঁচের "ওল্ড ফ্যাশন্ড" অনুসন্ধানের আবেদন সব দেশেই থাকে, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।[৪৮]

কিন্তু বিশ্ব শুধু এই এক জায়গায় থেমে নেই। গত দুই দশকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক ধরনের বিশ্বায়ন হয়েছে। গল্পের প্রয়োজনে প্রতিযোগিতা ভুলে কখনো একটি দেশের একাধিক গণমাধ্যম, কখনোবা একটি অঞ্চলের অনেক প্রতিষ্ঠান জোট বেঁধে কাজ করছে। কিন্তু আমাদের দেশে এধরণের সুযোগ এখনো তৈরি না হওয়ায় বৃহৎ কোন দুর্নীতি-অনিয়মের তথ্য উঠে আসবে এমন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এখনো বড় ধরণের সক্ষমতার ঘাটতি রয়ে গেছে। এমনকি এখন পর্যন্ত এখাতে গঠনমূলক, কার্যকর কোন পেশাদার সংগঠন বা কমন প্ল্যাটফর্মও তৈরি হয় নি। যার মাধ্যমে এখাতের চ্যালেঞ্জমূহ যেমন সামষ্টিকভাবে মোকাবিলা করা যাবে, তেমনি যুথবদ্ধ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে।[৪৯]

পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা

বাংলাদেশে পেশাদার সাংবাদিকদের সুরক্ষায় কোন আইনিকাঠোমো নেই। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও নিরাপত্তার পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা নেই। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচারের পর কিংবা অনুসন্ধানকালে প্রতিবেদকের কোন ক্ষতি হলে অথবা হুমকি তৈরি হলে তার প্রতিকার পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রভাব এবং ক্ষমতাসীনদের অসীম ক্ষমতার চর্চার পাশাপাশি দায়মুক্তির প্রবণতায় এই ঝুঁকি আরো বেড়েছে। উদাহরনস্বরূপ, কিছুদিন আগে একজন জেলা প্রশাসকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সংবাদ প্রচার করায় স্থানীয় একজন সাংবাদিককে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে মারধর, আটক ও

---

[৪৬] অভিমত/মতামত/গণমাধ্যমের-সর্বগ্রাসী-করপোরেটকরণ, দ্যা ডেইলি স্টার, ২৮ আগস্ট ২০২১ ৫, see: https://bit.ly/3rol47D

[৪৭] প্রাগুক্ত[১৩]

[৪৮] https://www.dhakapost.com/amp/opinion/9157

[৪৯] একান্ত সাক্ষাতকার, চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুন, ২০২১

নিপীড়নের পর মামলা হলে বিভাগীয় তদন্তে সেই কর্মকর্তাকে যৎসামান্য শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি তাকে পুরোপুরি দায়মুক্ত করে তার শাস্তি তুলে নেয়া হয়েছে।[৫০] এই ধরণের ঘটনা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ আরো বৃদ্ধি করে।

আর্টিকেল নাইনটিনের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে অন্তত ২৬৫ জন সাংবাদিকের ওপর আঘাত এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয় এর মধ্যে ১৬.৩২ শতাংশ আক্রমন ছিলো শারীরিক। এর মধ্যে ৭৭.৭৮ শতাংশ আঞ্চলিক পর্যায়ের এবং ২২.২২ শতাংশ সাংবাদিক ছিলেন রাজধানী শহরের। এর বাইরে ৭১.৯৫ শতাংশ সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মী আইনী জটিলতার শিকার হয়েছেন।[৫১] এধরণের আক্রমন ও হামলা-মামলার ঘটনা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আরো প্রবল হয়। চাকুরির অনিশ্চয়তার পাশাপাশি জীবনের নিরাপত্তাহীনতা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

এছাড়া পেশাগত দায়িত্বপালনকালে বা দায়িত্ব পালনের কারণে সাংবাদিকরা হামলা-মামলার শিকার হলে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকে সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ আছে করেন অনেক সংবাদকর্মীর। যেই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করা হলো, সেই প্রতিষ্ঠান থেকেই যদি বিপদে সহায়তা না পাওয়া যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার আগ্রহ নষ্ট হয়। অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে কোন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচার না হওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়, যা প্রতিবেদকের মনোবল ও উদ্যম যেমন নষ্ট করে তেমনি পেশাগত ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে।

করোনা মহামারী ও বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জঃ

করোনা মহামারির সময়ে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকরা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে মারাত্মক চাপের মধ্যে কাজ করছেন বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস বা আইসিএফজে ১২৫টি দেশের মোট ১,৪০৬ জন সাংবাদিকের ওপর পরিচালিত এই গবেষণায় আরও বলা হয়েছে এ পরিস্থিতিকে অনেকে তাদের সাংবাদিকতা পেশার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ জটিল অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করছেন।[৫২]

সাংবাদিক জন ক্রোলি এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেন যে, গত এক দশক ধরে সাংবাদিকরা একধরণের কঠিন ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সময় পার করছেন। গণমাধ্যমের ব্যর্থ ব্যবসায়িক মডেল, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা, বিকৃত মানসিক আঘাত, বিভ্রান্তি, অনলাইন ও আইনি হয়রানি ইত্যাদির পাশাপাশি পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্রমাগত চাপ তাদের ক্ষতি করেছে। করোনা মহামারী আসার আগে থেকেই গণমাধ্যম শিল্পের এই অবস্থা চলছে; মহামারি যা আরো তীব্র করে তুলছে। ক্রোলি (২০২১) যেমন স্পষ্টভাবে বলেন যে, মহামারীর চাপটি 'হিমশৈলের চূড়া' মাত্র, এবং এর আগেই অনেক সাংবাদিক দীর্ঘ ও সহিংস বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবেদনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যেগুলোর প্রভাব এখনো তারা কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছেন।[৫৩]

মহামারিকালে অসুস্থতা, মৃত্যু, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন, তীব্র হাহাকার, হারানোর যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করলেও সাংবাদিকদের মানসিক অবস্থা নিয়ে কেউ ভাবে নাই। ক্রমাগত বাজে সংবাদ এবং নিজ চোখে মৃত্যু ও অসহায়ত্ব দেখাটা সাংবাদিকদের মানসিক স্বাস্থ্যে ব্যাপক নেতিচক প্রভাব ফেলেছে। এবিষয়য়ে মনোবিজ্ঞানী এসথার পেরেল বলেন, "গণমাধ্যমের নিউজরুম শোকের মধ্যে রয়েছে এবং গত এক বছরে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।"[৫৪]

করোনা মহামারিতে বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের এই মানসিক অবসাদ বিষয়ে এক গবেষণায় দেখা যায়, লকডাউনে ৬৪ শতাংশ সাংবাদিকেরই কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা নেই। বরং ৫৯ শতাংশ বলেন যে লকডাউন তাদের জন্য আরো উদ্বেগ ও চাপ তৈরি করেছে। মহামারির প্রভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ৭৭ শতাংশই কাজের চাপের কথা জানিয়েছেন। ৫৯ শতাংশ সাংবাদিক এসময় বিষন্ন বা উদ্বিগ্ন বোধ করার কথা জানান। ৫৭ শতাংশ সাংবাদিক লকডাউন সংশ্লিষ্ট চাপ তাদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করেছে বলে জানান এবং ৪৪ শতাংশ সাংবাদিক পরিবার ও বন্ধুদের সাথে তাদের সম্পর্ককে প্রভাবিত করার কথা জানিয়েছেন।[৫৫]

এসব থেকে বোঝা যায় বিশ্বব্যাপীই করোনার প্রভাব সাংবাদিকদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তাদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেছে, মানসিক অবসাদ ও বাড়তি চাপ তৈরির পাশাপাশি তাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।

করোনা মহামারি এবং বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

২০২০ সালের মার্চে বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হওয়ার পর থেকে সংক্রমনের হার বিবেচনায় বিভিন্ন সময় আংশিক ও সম্পূর্ণ লকডাউন কার্যকর করে সরকার। এসময় জনগণের কাছে মহামারি বিষয়ক নানা তথ্য এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে সারাবিশ্বের মতই এদেশের সাংবাদিকরাও জীবন বাজি রেখে মাঠে কাজ করে গেছেন। কিন্তু এমন কঠিন ও প্রতিকূল সময়েও তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিলো না। আর্টিকেল নাইনটিন-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী করোনা মহামারিতে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত চাকরিচ্যুত হয়েছেন ১ হাজার ৬০০ গণমাধ্যমকর্মী। এর মধ্যে ১৫০ জন নারী সংবাদকর্মী

[৫০] কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসিকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি, প্রথম আলো, ২৭ নভেম্বর ২০২১। See: https://bit.ly/3IiKxp3

[৫১] https://www.article19.org/resources/bangladesh-protection-of-journalists-crucial-and-impunity-for-attacks-must-end/

[৫২] https://www.banglaconverter.org/tools.php?f=Unicode-To-Bijoy

[৫৩] https://gijn.org/2021/07/21/how-covid-19-compounded-journalisms-mental-health-crisis/

[৫৪] https://gijn.org/2021/07/21/how-covid-19-compounded-journalisms-mental-health-crisis/

[৫৫] https://www.johncrowley.org.uk/work-1/entry-03-8c3ap

রয়েছেন।[৫৬] প্রেস ইমব্লেম ক্যাম্পেইনের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমকর্মী মৃত্যুর তালিকায় বাংলাদেশ ষষ্ঠ অবস্থানে। অন্তত ৬৮ জন গণমাধ্যমকর্মী করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন।[৫৭]

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই যেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কঠিন, সেখানে করোনা মহামারির সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে যখন স্বাস্থ্যখাতে জরুরি সাড়া প্রদানের প্রয়োজনে বিপুল পরিমান কেনাকাটা করতে হয়েছে, স্বল্পতম সময়ে অবকাঠামো নির্মান করতে হয়েছে, বিভিন্ন সোর্স থেকে টিকা ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী ক্রয় করতে হয়েছে, তখন এখানে দুর্নীতি ও অনিয়মের ঝুঁকিও বেড়েছে। সে প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের নতুন পরিস্থিতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তথ্য সংগ্রহ এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়েছে। এসময় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কঠিন হয়ে উঠে। বিশেষ করে, সরকারি দফতরে তথ্য গোপনের চেষ্টা সাংবাদিকতাকে আরো কঠিন করে তোলে।

এসময় অনুসন্ধানী তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেককেই হামলা-মামলার শিকার হতে হয়েছে। সংবাদ কিংবা তথ্য প্রকাশের দায়ে অনেকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে মামলা করা হয়েছে, আটক করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর আওতায় অন্তত ৩৭ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত গুজব ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে কার্টুনিস্ট, সাংবাদিকসহ ৭৯টি ঘটনায় মোট ৮৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৫৮] অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা নিয়ে এতো দুর্নীতি বিশ্বের আর কোনো দেশে হয়নি।[৫৯]

মহামারির সময় সাংবাদিকতার এই সংকট আরো জটিলতর হয়ে উঠে, যখন তাদের মধ্যে নানা কারণে পেশাগত অসন্তুষ্টি ও মানসিক অবসাদ তৈরি হয়। অথচ করোনা মহামারির সময় ঠিক তাই হয়েছে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে তো বটেই, স্বাভাবিক সংবাদিকতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এসময় সাংবাদিকরা যেসব কারণে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন তার অন্যতম কয়েকটি বিষয় এখানে তুলে ধরছি।

সুরক্ষা সামগ্রীর অপ্রতুলতা

করোনা মহামারির সময় সাংবাদিকদের আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ছিলো সবচেয়ে বেশি। কারণ যখন সবাই ঘরে ছিলো, তখন সাংবাদিকদের বড় একটা অংশ ঘরের বাইরে থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছে। এসময় তারা আক্রান্ত ও করোনা সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের সংস্পর্শে যেমন এসেছেন, তেমনি আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিপূর্ণ স্পটগুলোতেও সমানতালে তাদের কাজ করতে হয়েছে। এসময় নিজ উদ্যোগে মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজারের মত সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় করলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেকেই তা পাননি। আবার যারা পেয়েছেন, তাদের অনেকেই অধিকাংশ সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক গবেষণায় দেখা যায়, ৯০ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন যে, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মীদের অপর্যাপ্ত ও যথাযথ সুরক্ষা সামগ্রী না দেয়ার কারণেই করোনায় গণমাধ্যমকর্মীদের আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার বেড়েছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তার কর্মীদের মাস্ক দিয়েছে (৮১ শতাংশ), কিন্তু পিপিই দিয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ প্রতিষ্ঠান।[৬০] অথচ করোনার শুরুতে সাংবাদিকরা পিপিই ছাড়া মাঠে কাজ করবে এটা অকল্পনীয় ছিলো।

মানসিক অবসাদ

মহামারির শুরু থেকেই একধরণের শংকা, দুঃসংবাদ আর প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জের হাঁপিয়ে উঠেছিলো সারা বিশ্বের মানুষ। সাংবাদিকরাও এর বাইরে ছিলো না। একে তো প্রতিনিয়ত পেশাদারী দায়িত্ব পালনে তাদের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কাজ করতে হতো, অন্যদিকে মানুষের মৃত্যু, অসুস্থতা, চিকিৎসাসেবার অভাবে হাহাকার, অস্থিরতা এবং সংবাদ প্রকাশের জন্য তথ্যের অপ্রতুলতা, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট বিবেচনায় চাকুরির অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নানা কারণে বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও মানসিক অবসাদে ভুগেছে। বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের গোপনীয়তার সংস্কৃতি আর দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্রে অনেকেই মানবিক ও পেশাগত উভয় দিক দিয়েই একধরণের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকদের অনেকেই মনে করছিলেন যে তারা 'মহামারী বুদ্বুদে' রয়েছেন। অনেকের মনে হয়েছিল, যে অবিরাম খারাপ সংবাদ সংগ্রহ করতে তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, সেখান থেকে পালানো কঠিন ছিল; এর ফলে তারা নিজেদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। মহামারিকালে সাংবাদিকরাও মানুষের সাথে কথা বলছিলেন, বিশ্বস্ততার সাথে তাদের ভূমিকা পালন করছিলেন, কিন্তু তারা কীভাবে কাজ করছে তা কেউ যাচাই করে দেখছিল না।[৬১]

বাংলাদেশেও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো তার কর্মীদের কাছে কাজ চেয়েছে। এমনিতেই এখানে সাংবাদিকদের কর্মঘন্টা বলে কিছু নেই, তার উপর মহামারির সময় অনেক প্রতিষ্ঠান পালা করে কর্মীদের অফিসে আনায় স্বল্প জনবল নিয়ে অফিসের চাহিদা পূরণে

---

[৫৬] https://www.article19.org/resources/bangladesh-protection-of-journalists-crucial-and-impunity-for-attacks-must-end/

[৫৭] https://www.pressemblem.ch/-1.shtml

[৫৮] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/covid-19/Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf

[৫৯] দেশে করোনা সংক্রমণের ৬ মাস: নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দুর্নীতি বড় বাধা, প্রথম আলো, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

[৬০] প্রাগুক্ত৩৩

[৬১] https://gijn.org/2021/07/21/how-covid-19-compounded-journalisms-mental-health-crisis/

তাদের অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করতে হয়েছে। মহামারিকালে বাইরে কাজ করে বাসায় পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ায় তাদের প্রতি যে ঝুঁকি তৈরি করা হয়েছিলো এটা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন ছিলো। এমন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করাটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে।

পেশাগত অসন্তুষ্টি

জনগনকে তথ্য জানাতে করোনাকালীন সময়ে সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করলেও এসময় তাদের জন্য আলাদা প্রণোদনা তো দূরের কথা, নিয়মিত বেতন ভাতা দেয়া নিয়েও নানা জটিলতা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা যায়, এসময় ৬৯ শতাংশ গণমাধ্যকর্মীই অসম্পূর্ণ বেতন বা বোনাস পেয়েছেন কিংবা বেতন পেলেও বোনাস পাননি অথবা কর্তিত হারে পেয়েছেন। অধিকাংশ সাংবাদিকই অর্থনৈতিক কষ্টে ভুগেছেন। সাংবাদিকদের বেতন ভাতা প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান।[৬২]

বছরের পর বছর প্রতিষ্ঠান লাভজনক থাকার পরও করোনায় সার্কুলেশন কিংবা বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ার অজুহাতে প্রতিষ্ঠানগুলো তার কর্মীদের বেতন ভাতা নিয়ে টালবাহানার পাশাপাশি আর্থিক সংকটের যুক্তি তুলে কর্মী ছাঁটাই করেছে। এবিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সংকটের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে একজন গণমাধ্যমকর্মী বলেন, *"এতবছর লাভ করার পর করোনার প্রথম দুই-তিন মাস বিজ্ঞাপন কমে যাওয়ার অজুহাতে কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা দিতে না পারা কিংবা ছাঁটাইয়ের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তো দূরের কথা, অনেকেই নিয়মিত পেশাগত দায়িত্ব পালনই করতে পারেন নি। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে আর যাই হোক, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয় না। তবুও আমাদের সহকর্মীরা এর মধ্যেই অনেক ভালো কাজ করেছেন। অথচ এমন হওয়ার কথা ছিলো না। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা নাই-ই থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে তারা সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স পান?"*[৬৩]

জাতিসংঘ মহাসচিব ২০২০ সালে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে বলেছিলেন যে, *"গণমাধ্যমকর্মীরা করোনার সময় যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেমন বঞ্চিত হয়েছে তেমনি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে।"*[৬৪] মুক্ত গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারার ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে যেমন দূর্বল করে, তেমনি জনগণের অবাধ ও নিরপেক্ষ তথ্য লাভের অধিকার খর্ব করে। বিশেষ করে, কোভিড ১৯ অতিমারিকালে সাংবাদিকদের তথ্যের অভিগম্যতা এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে প্রতিকূলতা, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও স্পর্শকাতর প্রতিবেদন প্রকাশের সুযোগ সংকুচিত করেছে।"[৬৫]

করোনার সময় নানাবিধ প্রতিকূলতার পাশাপাশি চাকুরি ও আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত অসন্তুষ্টি তাদের কাজের প্রেরণা নষ্ট করেছে। এতে করোনাকালে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

তথ্যের গোপনীয়তা

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর শুরু থেকেই দায়িত্বশীল ও রাষ্ট্রনেতাদের পক্ষ থেকে তথ্য গোপনের একধরণের প্রয়াস দেখা যায়। গণমাধ্যমের ওপর সেন্সরশিপের অনুপস্থিতি ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা থাকলে চাইনিজ গণমাধ্যম করোনা অতিমারি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার সুযোগ পেত, এতে সেখানকার হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেতো এবং করোনার বৈশ্বিক অতিমারি রূপ নেয়া প্রতিহত করা সম্ভব হতো। আরেক বিশ্লেষণে উঠে আসে, করোনাভাইরাস সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হলে, চীনে ৮৬ শতাংশ সংক্রামণ কমানো সম্ভব হতো।[৬৬]

অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মিডিয়াকে 'জনশত্রু বা জনগণের শত্রু' বলে অভিহিত করে করোনা সম্পর্কে মিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ভুয়া বলে প্রতিনিয়ত বিবৃতি দেওয়ায় তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়, যার ফলে আমেরিকায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৭] এমনকি জাতিসংঘ মহাসচিব তথ্যের এই গোপনীয়তা, লুকোছাপাকে এবং ভুল তথ্যের ব্যাপক প্রচারকে 'তথ্যের মহামারি' নামে অভিহিত করেন।[৬৮]

বাংলাদেশে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে সংক্রমণ যখন বাড়ছিলো তখন *"আমরা করোনার চেয়ে শক্তিশালী"*[৬৯] বক্তব্য দিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক। এরপর যখন করোনা মোকাবিলায় গৃহিত নানা কার্যক্রমে একের পর দুর্নীতি, অনৈতিক যোগসাজশ ও সমন্বয়হীনতার খবর গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেতে থাকলো, তখন স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

[৬২] প্রাগুক্ত৩৩

[৬৩] ব্যক্তিগত একক সাক্ষাতকার, ২০২১

[৬৪] Jornalists provide 'antidote' to COVID-19 misiformation: UN Chief, https://news.un.org/en/story/2020/05/1063012

[৬৫] ড. ইফতেখারুজ্জামান, মে ২০২১। See: https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/media-release/6272-2021-05-02-14-19-05

[৬৬] https://rsf.org/en/news/if-chinese-press-were-free-coronavirus-might-not-be-pandemic-argues-rsf

[৬৭] https://blogs.lse.ac.uk/usappblog/2020/04/02/trumps-poor-relationship-with-the-media-has-made-the-us-covid-19-outbreak-worse/

[৬৮] https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-misinformation-and-cybercrime-covid-19

[৬৯] https://www.somoynews.tv/pages/details/203945/%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%BE

অনুমতি ছাড়া জনসমক্ষে ও গণমাধ্যমে কোনো বিবৃতি বা মতামত প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[৭০] এছাড়া, নিয়মিত ব্রিফিংয়ের বাইরে স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও টকশোতে অংশ নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (ডিজি) অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৭১]

এসময় হুট করেই বেসরকারি টেলিভিশনসমূহ মনিটর করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হলেও সমালোচনার মুখে তা বাতিল করা হয়, কিন্তু এই বিষয়ে সংশোধিত নতুন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, "সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোভিড-১৯ বিষয়ে কোনো গুজব বা ভুল তথ্য প্রচার হচ্ছে কী-না, তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রচারমাধ্যমকে সহায়তা করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একজন সাবেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা লিখেছেন, "গণমাধ্যম ২৪ ঘন্টা মনিটর করা হয়, হচ্ছে।"[৭২] বাংলাদেশে করোনার গতি প্রকৃতি জানা দুরূহ হয়ে পড়ে। একমাত্র সরকারি সূত্র ছাড়া বিকল্প কোনো পথ বন্ধ হয়ে যায়। নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে স্বাভাবিক তথ্য প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়।[৭৩]

করোনাকালীন লকডাউন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি সহায়তার ত্রাণ বিতরণে চুরি ও আত্মসাতের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে গণমাধ্যমকর্মীদের বাধা, হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে করোনা নিয়ে এতো দুর্নীতি বিশ্বের আর কোনো দেশে হয়নি।[৭৪] এসব ঘটনায় করোনাকালে দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ব্যাপক হুমকির মুখে পড়ে এবং বাধাগ্রস্ত হয়।

উপসংহার

এই আলোচনা থেকে যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শুধু চ্যালেঞ্জিং পেশাই নয়, বরং এটি আত্মোৎসর্গমূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৭৫] এদেশের সাংবাদিকদের পেশাগত নানা জটিলতা, চ্যালেঞ্জ, অসন্তুষ্টির পাশাপাশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের বাণিজ্যিকিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের ঘাটতি এবং পেশাদারিত্বের অভাব সাংবাদিকতাকে আরো কঠিন করে তুলেছে। এছাড়া গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণমূলক নানাবিধ আইন ও নীতি এবং সরকারি-বেসরকারি নানা প্রতিবন্ধকতা ছাপিয়ে সাংবাদিকতা, বিশেষ করে–অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। দেশ যখন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হতে যাচ্ছে, সরকারি ভাষ্যে চারিদিকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মহাবয়ান চর্চিত হচ্ছে, তখন 'গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ' গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের এমন দৈন্য দশা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক যাত্রাকে অসম্ভব এক যাত্রায় পরিণত করার যুক্তি তৈরি করছে। 'ছদ্মবেশী গণতন্ত্র'[৭৬] ও 'জনবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন'–এর এক অস্থির গড্ডায় নিমজ্জিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হবে। তাই অবিলম্বে সাংবাদিক বান্ধব নীতি-কাঠামো, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের পেশাদারিত্ব, সঠিক মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও নিশ্চয়তা এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

---সমাপ্ত---

[৭০] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2020/report/covid-19/Covid-Resp-Track-Full-BN-15062020.pdf

[৭১] গণমাধ্যমে কথা বলতে স্বাস্থ্যের কর্মকর্তাদের অনুমতি নিতে হবে, প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০২০

[৭২] https://www.thedailystar.net/bangla-টেলিভিশন 'মনিটরিংয়ের' প্রজ্ঞাপন সংশোধনে স্বস্তির কিছু নেই

[৭৩] সরকারি সূত্র ছাড়া করোনার খবর জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল; https://mybangla24.com/VOA-Bangla-News

[৭৪] দেশে করোনা সংক্রমণের ৬ মাস: নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দুর্নীতি বড় বাধা, প্রথম আলো, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

[৭৫] Rahman, G, Communication in Bangladesh, Media Response and Campaign Strategy, Srabon Prokashani, 2006.

[৭৬] Botz, Dan La, Mask of Democracy: Labor Suppression in Mexico Today, South End Press (July 1, 1999) and https://www.researchgate.net/publication/263535776_Iraq_The_Masked_Democracy